ইপাইওরানিস আইল্যান্ড রহস্য

এইচ জি ওয়েলস

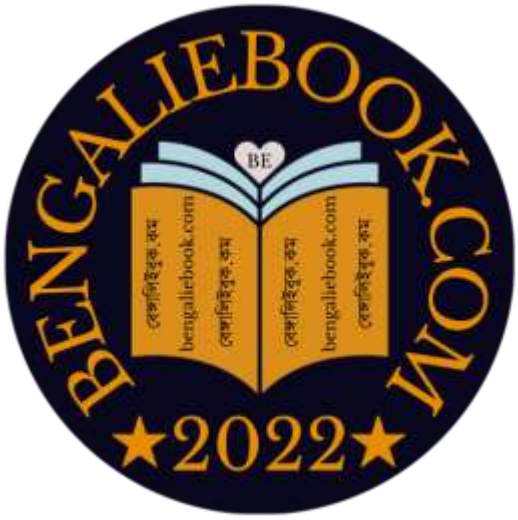

ইপাইওরনিস আইল্যান্ড রহস্য

(Epyornis Island)

একে তো ওই ষণ্ডা চেহারা, তার ওপর চোয়াড়ে মুখজোড়া বিরাট কাটার দাগ। দেখলেই গা শিরশির করে।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আমার পুঁটলির দিকে তাকিয়ে সে বললে, অর্কিড চারা মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ।

সাইপ্রিপেডিয়াম নিশ্চয়?

বেশির ভাগ তা-ই।

নতুন কিছুই পাননি। পঁচিশ... না, না, সাতাশ বছর আগে ও দ্বীপের সব দেখে এসেছি। কতই বা বয়স তখন। উড়ে উড়ে বেরিয়েছি। কাঁচা বয়সে যা হয় আর কী। দুবছর ছিলাম ইস্ট ইন্ডিজে, ব্রাজিলে সাত বছর। তারপর গেলাম মাদাগাসকারে।

জনাকয়েক অভিযাত্রীর নাম আমার জানা আছে। কার চাকরি নিয়ে গিয়েছিলেন?

ডসন-এর। বুচার নামটা জানা আছে?

বুচার? খুবই চেনা-চেনা মনে হল নামটা। তারপরেই মনে পড়ে গেল বুচার বনাম ডসন মোকদ্দমা-কাহিনি–আচ্ছা! আপনিই তাহলে বুচার! চার বছরের মাইনে আদায় করেছিলেন মামলা ঠুকে দিয়ে। চার বছর মরুদ্বীপে পরিত্যক্ত থাকার মাইনে–

মাথা নুইয়ে সবিনয়ে অভিবাদন জানিয়ে ষণ্ডা বুচার বললে, খুবই মজার মামলা, তা ই না? চার-চারটে বছর দ্বীপে আটক ছিলাম, চাকরি থেকে জবাব দিতেও পারেনি। বছর বছর মাইনের টাকা জমা হয়েছে, দ্বীপে বসে আমি তার হিসেব রেখেছি।

ইন্টারেস্টিং।

খুবই। ইপাইওনিস নামটা নিশ্চয় শুনেছেন?

একটু একটু। মাসখানেক আগে অ্যান্ড্রুজ বলছিল। গবেষণা করছে একটা প্রজাতি নিয়ে, শোনার পরেই পাড়ি দিয়েছিলাম সমুদ্রে। একখানা মাত্র ঊরুর হাড় নিয়ে কেন যে এত পাগলামি।

ঊরুর হাড়?

হ্যাঁ। গজখানেক লম্বা। যার হাড়, সে নাকি দৈত্য বললেই চলে।

দৈত্য তো বটেই। সিন্দবাদের কিংবদন্তি এদের নিয়েই লেখা হয়েছে। কবে পেয়েছিল হাড়খানা?

বছর তিন-চার আগে। একানব্বইতে। কেন বলুন তো?

কেন মানে? ও হাড় তো আমিই আবিষ্কার করেছিলাম, বিশ বছর আগে। মাইনে নিয়ে ডসন কাদা ছোঁড়াছুড়ি না করলে ওই একখানা হাড়ের দৌলতেই মাতব্বর হয়ে যেতে পারত।

পেলেন কী করে?

হঠাৎ। নৌকোটা যে অমনভাবে নিজের খেয়ালে ঠিক ওই দ্বীপটাতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে ঠেকবে, তা তো জানতাম না। আস্তানানারিভো থেকে প্রায় নব্বই মাইল উত্তরে সে বিরাট একটা জলাভূমি।

অ্যান্ড্রুজ তো বলছিল, জলা জায়গায় পাওয়া গেছে হাড়খানা।

পূর্ব উপকূলে আছে জায়গাটা। আপনার চোখে পড়েনি। জলের গুণেই হোক কি যে কারণেই হোক, পচন ধারেকাছে ঘেঁষতে পারে না। গন্ধটা অনেকটা আলকাতরার মতো। ত্রিনিদাদের কথা মনে পড়ে যায়। ডিম পেয়েছিল আপনার বন্ধুরা? আমি পেয়েছিলাম। লম্বায় দেড় ফুটের মতো। গোল হয়ে ঘুরে গিয়ে জলাভূমি ঘিরে রেখেছে পুরো তল্লাটটাকে। বেশির ভাগই নুন। কপালজোরে পেয়ে গিয়েছিলাম ডিমগুলো। গিয়েছিলাম অবশ্য ডিম খুঁজতেই; দুজন কালা আদমি ছিল সঙ্গে। খানকয়েক ক্যানো নৌকো একসঙ্গে পাশাপাশি বেঁধে নিয়েছিলাম। তাঁবু ছিল সঙ্গে। ছিল চার দিনের খাবারদাবার। জমি যেখানে মোটামুটি শক্ত, কাদা কম, তাঁবু পেতেছিলাম সেখানে। সে কী গন্ধ মশায়! এখনও নাকে লেগে রয়েছে। দিনরাত ওই আলকাতরার গন্ধ সইতে হয়েছে। কাজটা

কিন্তু মজার। লোহার শিক নিয়ে কাদা খোঁচানো, বাস! ওভাবে খোঁচাখুঁচি করলে ডিম কি কখনও ব্যস্ত থাকে? ডিম ফুটে কবে তারা শেষবারের মতো দাপিয়ে বেড়িয়েছিল দ্বীপময়, কালা আদমিদের কিংবদন্তি থেকে নাকি তা জানা যায়। কথাটা মিশনারিদের। আমি কিন্তু মশাই কোনও গল্পই শুনিনি। জীবন্ত ইপাইওরনিস কোনও ইউরোপীয়ের চোখে পড়েনি আজও। ১৭৪৫ সালে ম্যাকার নাকি মাদাগাসকার গিয়ে দেখেছিলেন। কিন্তু তা বিশ্বাস করতে মন চায় না। আমি কিন্তু তাজা ডিম পেয়েছিলাম। যেন সদ্য-পাড়া। এক্কেবারে টাটকা! নৌকোয় বয়ে আনতে গিয়ে পাথরে পড়েই মাস করে চৌচির একখানা। কী মিষ্টি গন্ধ মশায়, টাটকা ডিমে যেমন হয়। বাসি হলে পচা গন্ধ বেরত। অথচ ধরুন ডিম বেরিয়েছে যার পেট থেকে, সে অক্কা পেয়েছে চারশো বছর আগে। সারাদিন গেল কাদা ঘেঁটে ডিম বার করতে। মেজাজ খিঁচড়ে তো যাবেই। তবে হ্যাঁ, ডিমের মতো ডিম পেয়েছিলাম বটে। পরে লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে গিয়ে দেখেছিলাম খানকয়েক ডিম। চটা-ওঠা, খোলা-ভাঙা, ফুটিফাটা। আমার ডিমের মতো নয়, চিড় পর্যন্ত খায়নি খোলায়।

এই পর্যন্ত বলে মাটির পাইপ বার করেছিল বুচার। তামাকের থলি রেখেছিলাম সামনে। অন্যমনস্কভাবে পাইপে তামাক ভরতে ভরতে সে বলেছিল, মোট তিনটে আস্ত ডিম পেয়েছিলাম। বিলকুল তাজা, নৌকোয় রেখে ডাঙায় নেমেছিলাম তাঁবুতে বসে এক মগ কফি বানিয়ে খাব বলল। ভুল করেছিলাম সেইখানেই।

কেন?

যে কালা আদমিটার হাত ফসকে আস্ত একখানা ডিম পড়ে ফুটিফাটা হয়েছিল, তাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছিলাম রাগের মাথায়। রাগলে আমি চণ্ডাল, কী করি বলুন। তা-ই বলে শোধ নেবে ওইভাবে? ভাবতেও পারিনি। কেটলিতে জল ফুটছে, মজাসে পাইপ টানছি–দুচোখ ভরে দেখছি জলাভূমির ওপর সূর্যাস্ত। সে এক খাসা দৃশ্য মশায়। সামনে লাল আকাশ, ধূসর পাহাড়, পেছনে কালো কাদা। মনে মনে হিসেব করছি, নৌকোয় আছে তিন দিনের মতো খাবার আর এক পিপে জল। ভয়ের কিছু নেই। এমন সময়ে একটা শব্দ কানে ভেসে এল। চোখ ফিরিয়ে দেখি, নৌকো নিয়ে হারামজাদারা সরে গেছে ডাঙা থেকে। বিশ গজ দূরে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম মতলব কী শয়তানের বাচ্চাদের। বন্দুক একটা আছে বটে তাঁবুতে–কিন্তু বুলেট নেই–পাখি-মারা ছররা আছে। হারামজাদারা তা জানে। তবে একটা ছোট রিভলভার ছিল পকেটে। টেনে বের করে দৌড়ালাম সমুদ্রের ধারে। তুলে ধরে হেঁকে বললাম ফিরে আসতে। কিন্তু কাজ হল না। উলটে সে কী টিটকিরি মশায়! হাড় জ্বলে গেল আমার। দিলাম দমাদম গুলি চালিয়ে। নৌকো তখন পঞ্চাশ গজ দূরে। কিন্তু এক বেটাকে ফেলে দিলাম জলে। আর-একটা মুখ গুঁজরে শুয়ে পড়ল খোলে। দাঁড়টাও ভেসে গেল জলে।

গলাবাজি করে কোনও লাভ নেই জেনে, জামাকাপড় খুলে, দাঁতে ছুরিখানা কামড়ে নিয়ে লাফ দিলাম জলে। সাঁতরে উঠব নৌকোয়–নৌকো যদিও ততক্ষণে বেশ দূরে। জলে হাঙর আছে জানি–সেই ভয়ে তো এই বিজন দ্বীপে একলা পড়ে থাকতে পারি না। যে নৌকোয় দাঁড় নেই, তা স্রোতের টানে কোনদিকে ভেসে যাবে, আঁচ করে নিয়ে সাঁতরে চললাম সেইদিকেই। নৌকো অবশ্য তখন দেখা যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়েও এল, কালো কালির মতো অন্ধকারে ঢেউয়ের ডগায় সে কী ফসফরাসের

আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়! মাথার ওপর তেমনি তারার আলো। একটু পরেই দেখলাম কালো জমাট ছায়া। নৌকো। তলায় ঢেউ আছড়ে পড়ছে–

ফসফরাসের আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। চুপিসারে গেলাম কাছে। ভেবেছিলাম, ছুরি চালানোর দরকার হবে। কিন্তু হাত গন্ধ করতে হল না। মুখ গুজরে যে বেটা খোলে লটকে পড়েছিল –আমার গুলিতেই তার প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। লাশটা ফেলে দিলাম জলে।

খানকয়েক বিস্কুট আর জল খেয়ে একটু ঝিমুনি এসেছিল। ভোর হল, ডাঙার চিহ্ন কোনওদিকে দেখলাম না। দূরে একটা পালতোলা জাহাজের মাস্তুলের ডগাটুকুই কেবল দেখা গেল–দূরেই তা মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর সূর্য আসতেই চড়া রোদে প্রাণ যায় আর কী। বিস্কুট মোড়া ছিল একটা খবরের কাগজে। জীবনে কাগজ পড়ি না মশায়। জঘন্য! সেদিন কিন্তু কাজে দিল কাগজখানা। মাথায় ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বার কুড়ি পড়েও ফেললাম। তা সত্ত্বেও ফোঁসকা পড়ে গেল সারা গায়ে।

দিন দশেক কষ্ট সয়েছি এইভাবে। কী মারাত্মক রোদ! চোখ মেলে তাকাতেও পারিনি। ভোরবেলা আর বিকেলবেলা দেখতাম, জাহাজ-টাহাজ দেখা যায় কি না। দেখেওছিলাম–দুবার। গলাবাজি করেও কাউকে কাছে আনতে পারিনি। দ্বিতীয় দিন একটা ডিম ভেঙে খাওয়া আরম্ভ করেছিলাম। একটু গন্ধ থাকলেও খারাপ নয়। অনেকটা হাঁসের ডিমের মতো। হলদে কুসুমের একপাশে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা এক ধ্যাবড়া দাগ দেখেছিলাম। সরু সরু সুতোর মতো রক্ত আর মইয়ের মতো কী যেন ছিল তাতে–অদ্ভুত। মানে বুঝতে পারিনি তখন–পরে পেরেছিলাম। তিন দিন ধরে খেয়েছিলাম ওই একখানা ডিম–বিস্কুট আর জলের সঙ্গে। আট দিনের দিন আর-একখানা ডিম ভাঙবার পর খাড়া হয়ে গেল

গায়ের লোম। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ডিম ফুটছিল একটু একটু করে। বিশ্বাস করা যায় না। আমার কিন্তু হয়েছিল। চোখের সামনে দেখে বিশ্বাস না করে পারা যায়? তা ধরুন শতিনেক বছর কালো কনকনে কাদায় পোঁতা ছিল ডিমখানা–একদম নষ্ট হয়নি–এখন বাচ্চা তৈরি হচ্ছে রোদের তাতে। জ্বণই তো বলে?–জ্বণের মধ্যে বিরাট মাথা আর বাঁকা পিঠ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গলার নিচে হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করছে, কুসুম শুকিয়ে আসছে, মস্ত পাতলা পরদা খোলার ভিতরে ছড়িয়ে পড়ছে, কুসুম ঢেকে ফেলছে। কী কাণ্ড বলুন তো! ভারত মহাসাগরের ঠিক মধ্যিখানে ডিমে তা দিচ্ছি! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি যারা ছিল, তাদেরই একজনের ডিম–কোনকালে লোপ পেয়েছে, কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বেরচ্ছে আমার সামনে! ডসন যদি জানত, চার বছরের মাইনে এককথাতে বার করে দিত! তা-ই না?

তা-ই বলে খেতেও ছাড়িনি। আধফোঁটা বাচ্চাকেই খেয়েছি একটু একটু করে। বিতিকিচ্ছিরি খেতে। তৃতীয় ডিমটাকে আর ভাঙিনি। রোদ্দুরের সামনে তুলে ধরেছিলাম। খোলার মধ্যে দিয়ে কিছু দেখতে পাইনি। তবে রক্তচলাচলের শব্দ যেন শুনতে পেয়েছিলাম। কানের ভুলও হতে পারে।

তারপর পেছোলাম অ্যাটলে। চাকার মতো প্রবালদ্বীপ-মাঝখানে উপহ্রদ। তখন সূর্য উঠেছে অ্যাটলের সামনে। আধ মাইল পথ হাতে করে দাঁড় টেনেছিলাম, কখনও ডিমের ভাঙা খোলা দিয়ে। স্রোতের টান নৌকোকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মরিয়া হয়ে জল কেটে নৌকো নিয়ে গেলাম তীরে। মামুলি অ্যাটল। ডাঙায় নেমে দেখলাম গোটাকয়েক গাছ, একপাশে একটা ঝরনা, হ্রদ বোঝাই কাকাতুয়া-মাছ। একপাক ঘুরে এলাম, মোটে মাইল চারেক। ডিমটাকে ডাঙায় রাখলাম রোদের তাতে বালির ওপর, জল

সেখানে পৌঁছায় না। নৌকোটাকে টেনে তুলে রেখেছিলাম আগেই। তারপর শুরু হল রবিনসন ক্রুসোর জীবন। ছেলেবেলায় ভাবতাম খাসা জীবন। এখন দেখলাম জঘন্য। একঘেয়ে। খাবার খুঁজতে খুঁজতেই গেল প্রথম দিনটা। দিনের শেষে ঝড় উঠল, বৃষ্টি নামল রাতে।

ঘুমাচ্ছিলাম ক্যানোর তলায়। কপাল ভালো, ডিমটা ছিল অনেক উঁচুতে, বালির ওপর। হঠাৎ একটা ভয়ানক শব্দ শুনলাম। যেন একশো নুড়িপাথর আছড়ে পড়ল ক্যানোর গায়ে। ঢেউ চলে গেল মাথার ওপর দিয়ে। স্বপ্ন দেখছিলাম। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় অন্ধকারে হাতড়েছিলাম চেয়ার আর দেশলাই। তারপরেই খেয়াল হল, আছি কোথায়। ফসফরাস জ্বলা ঢেউ যেন গিলে খেতে আসছে। আলো আর কোথাও নেই, আকাশ কালোকালির মতো রাত। বাতাস চেঁচিয়ে যাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। মেঘ ঝুলে পড়েছে, মাথায় ঠেকে আর কী। বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে, আকাশ যেন ফুটো হয়ে গেছে। আগুন সাপের মতো কিলবিল করে বিরাট একটা ঢেউ তেড়ে এল আমাকে পেটে পুরতে। ভোঁ দৌড় দিলাম তক্ষুনি। ঢেউ যখন নেমে যাচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে, ফিরে এলাম ক্যানোর কাছে। কিন্তু কোথায় ক্যানো? ডিমটাকে কিন্তু ঢেউ ধরতে পারেনি। ওই ডিমের পাশেই গুটিসুটি মেরে বসে কাটিয়ে দিলাম রাত। সে কী রাত! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, এই দেখুন।

ভোর হল। ঝড় থামল। বালির ওপর নৌকোর কঙ্কালটাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখলাম। কুড়িয়ে আনলাম তক্তাগুলো। দুটো লাগোয়া গাছের ওপর পেতে বানিয়ে নিলাম ছাউনি। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরল সেইদিনই।

আমি তখন ঘুমিয়ে কাদা ডিমটাকেই মাথার বালিশ করে। হঠাৎ খটাং করে একটা আওয়াজে চটকা ভাঙল। ঝাঁকুনি লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসেছিলাম। দেখি কী, খোলা ফুটো হয়ে গেছে। ফাঁক দিয়ে একটা কদাকার বাদামি মুন্ডু আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে। খাতির করে ডেকেছিলাম, এসো বাবা এসো, দুদু দেব, মাছ দেব, টুকুটুকু এসো। শুনেই খুটুর খুটুর করে সে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রথমদিকে মনের মতোই সঙ্গী পেয়েছিলাম। আকার-আয়তনে ছোট্ট মুরগি বললেই চলে। পাখির ছানার মতোই দেখতে–একটু যা সাইজে বড়। গোড়ায় পালক ছিল নোংরা বাদামি রঙের, ধুলো-রঙের মামড়ি একটু ছিল, খসে গেল দুদিনেই। দেখা গেল চুলের মতো পালক। নাম দিলাম তার ফ্রাইডে। রবিনসন ক্রুসোর ফ্রাইডে ছিল মানুষ-সঙ্গী। আমার ফ্রাইডে হল তিনশো বছর আগেকার দানব-পাখির ছানা। কুৎসিত। গা ঘিনঘিন করেছিল ঠিকই। কিন্তু মুরগির মতোই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে ক্যাঁ-কোঁ আওয়াজ করে খাবার খুঁটতে শুরু করতেই মনটা হু-হুঁ করে উঠেছিল। আহা রে, মা নেই, বাবা নেই। খাবার জোগাতে হবে তো আমাকেই। ল্যাগুন থেকে কাকাতুয়া-মাছ ধরে এনে খেতে দিয়েছিলাম। দিতে-না দিতেই শেষ। আরও চাই। ঠোঁট ফাঁক করে সে কী লাফাই। মজা পেয়েছিলাম। তেমন। বুঝলে ওকেই খাওয়া যাবে। বড় হোক।

দিনরাত ঘুরত সঙ্গে ন্যাওটার মতো। মাছ ধরতাম, যখন পাশে দাঁড়িয়ে দেখত। যা মাছ উঠত, তার বখরা নিত–আমাকেও দিত। বালির ওপর একরকম আচারের শসার মতো ছোট শসা গজাত এন্তার। গায়ে ছোট ছোট আঁচিল। একদিন একটা ঠুকরেই এমন মেজাজ খিঁচড়ে গেল যে, আর এদিক মাড়ায়নি। ইন্টারেস্টিং, তা-ই না?

দিনে দিনে বেড়ে চলল ইপাইওনিস ছানা। রোজই দেখতাম যেন বাড়ছে একটু করে। দুবছর দেখেছিলাম এইভাবে। বেশ সুখে ছিলাম মশায়। কাজকর্ম নেই, মাথাব্যথাও নেই। মাইনে জমা পড়ছে ডসনের অফিসে। সময় কাটানোর জন্য দ্বীপটাকে সাজাতাম মনের মতো করে। শামুক, ঝিনুক, গেঁড়ি কুড়িয়ে এনে বালির ওপর সাজিয়ে লিখেছিলাম দ্বীপের নাম–ইপাইওরনিস আইল্যান্ড। দ্বীপের সব দিকেই। তারপর শুয়ে শুয়ে দেখতাম, জাহাজ টাহাজ আসে কি না। আশপাশে ঝাঁপাই জুড়তে দৈত্য-পাখির ছানা। বাড় দেখে অবাক হতাম। যত দিন যাচ্ছে, ততই খোলতাই হচ্ছে চেহারাটা। মাথায় নীল ঝুঁটি গজাল চোখের সামনেই, সবুজ পালক গজালো পেছনে। ঝড়বৃষ্টির সময়ে ছাউনির তলায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে থেকেছি কত দিন কত রাত। ঝড়বৃষ্টি থামলে আবার টহল দিতে বেরিয়েছি। যদি কিছু ভেসে আসে, এই আশায়; এই দুবছরে মাঝে মাঝে পালের ডগা চোখে পড়েছে। –কিন্তু দ্বীপের দিকে আসেনি কোনও জাহাজ।

বড় সুখে ছিলাম। স্বর্গসুখ বললেই চলে। তামাক ছিল না, এইটুকুই যা দুঃখের। কিন্তু এত সুখ সইল না। দ্বিতীয় বছরের শেষাশেষি কপাল ভাঙল। ফ্রাইডে তখন মাথায় চোদ্দো ফুট উঁচু। গাঁইতির ফলার মতো ইয়া মুন্ডু ঘাড়ের ওপর। মস্ত দুটো বাদামি চোখ। চোখ ঘিরে হলুদ আংটি। ঠিক মানুষের চোখের মতোই কাছাকাছি চোখ, কিন্তু মুরগির চোখের মতো দুদিকে সরানো নয়। মিহি পালক-অস্ট্রিচের পালকের মতো কর্কশ নয়। রং আর পালক দুটোই নিউ গিনির ক্যাসয়ারি বা এমু পাখির মতো অনেকটা।

কিন্তু রক্তে যার বেইমানি রয়েছে, তার বাইরে দেখে কি চেনা যায়? চেহারা যত খোলতাই হয়েছে, গায়েগতরে ভারী হয়েছে আমারই হাতে খেয়ে, ততই তিরিক্ষে হয়েছে। মেজাজ। ঘাড় বেঁকিয়ে কিনা তেড়ে আসে আমাকেই? নেমকহারাম কোথাকার!

একদিন হিমশিম খেয়ে গেলাম মাছ ধরতে গিয়ে। মাছ আর পাই না–এদিকে হারামজাদা ইপাইওরনিস সমানে ঘুরঘুর করছে আমার পাশে–মনে মনে যেন একটা মতলব আঁটছে। খিদেয় পেট জ্বলছে বুঝতে পারছি, সমুদ্রের শসা তো পড়ে রয়েছে– খেলেই হয়। শয়তানের বাচ্চার আবার তা মুখে রোচে না। অনেক কষ্টে পেলাম একখানা মাছ। পেট চুইচুই করছে আমারও। তাই ভাগ দিতে চাইনি। আরে সব্বনাশ! হোঁয়াক করে কিনা তেড়ে এসে কামড়ে নিল মাছখানা, হ্যাঁচকা টান মেরে কেড়ে নিয়ে মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিয়েছিলাম। বাস–সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

মুখখানা দেখুন। আচমকা রামঠোক্করেই এই কাণ্ড। এ কাটার দাগ জীবনে আর মেলাবে? ঠোক্কর মেরেও রেহাই দিল না। কী করল জানেন? ধাঁই করে সে কী লাথি! ঘোড়ার চাট সে তুলনায় কিছুই নয়। ঠিকরে পড়েই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। ফের তেড়ে আসছে দেখেই দুহাতে মুখ ঢেকে দৌড়েছিলাম পাঁইপাঁই করে। কিন্তু কী বলব মশায়, হারামজাদা পক্ষিরাজের মতো সাঁইসাঁই করে তেড়ে এল। রেস-হর্সও অত জোরে ছুটতে পারে না। তারপরেই শুরু হল রামধোলাই। উফ! লাথির পর লাথি–সেই সঙ্গে ঠোক্করের পর ঠোক্কর! এক-একখানা লাথি দুরমুশের মতো যেন হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতে লাগল–আছড়ে আছড়ে ফেলতে লাগল এক-একদিকে–সেই সঙ্গে পিঠের ওপর চলল গাঁইতি ঠোঁটের ধারালো ঠোক্কর। কোনওমতে ঠিকরে গিয়ে পড়েছিলাম ল্যাগুনের জলে– গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে পড়েছিলাম। হারামজাদা বেল্লিকের বাচ্চা জলে নামবে না জানি গা ভিজে যাবে যে! সে কী ঝাঁপাই। চিৎকারটা অনেকটা ময়ূরের ডাকের মতো, তবে সাংঘাতিক চড়া। সহ্য করা যায় না। ঝুঁটি উঁচিয়ে শুরু হল পায়চারি বালির ওপর, যেন নবাবপুত্তুর। না বলেও পারছি না, খানদানি টহল দেখে নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছিল। ওরকম

লর্ড স্টাইলে হাঁটা আমার দ্বারা জীবনে হবে না। দেখছি আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। সারা শরীর থেঁতলে দিয়েছে শয়তানের বাচ্চা, দরদর করে রক্ত পড়ছে মুখের এই কাটা থেকে।

কাটাছেঁড়া থেঁতলানির যন্ত্রণাকেও ছাপিয়ে উঠল মনের যন্ত্রণা। ডিম ফুটিয়ে যাকে জন্ম দিলাম, খাইয়েদাইয়ে এতটা বড় করলাম, তার কাছে এইরকম নেমকহারামি আশা করতে পারিনি। বেটাছেলের মেজাজ ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকা দরকার বুঝলাম। সাঁতরে গেলাম একটা লম্বা তাল গাছের তলায়। ডগায় উঠে বসে রইলাম চোরের মতো। ভাবুন তখন আমার মনের অবস্থাটা! একটা বেইমানের ভয়ে জুজু হয়ে বসে রয়েছি বিজন দ্বীপের সবচেয়ে উঁচু গাছের ডগায়! মানুষের বাচ্চা আমি। চারশো বছর আগে লোপ পেয়ে-যাওয়া একটা পাখির বাচ্চার ভয়ে কাঁপছি ঠকঠক করে।

ভেবেছিলাম, মেজাজ ঠান্ডা হলেই শয়তানের বাচ্চা সব ভুলে যাবে। ব্রেন আর কতটুকু। তারপর মওকা বুঝে নেমে আসব। মাছ নিয়ে আস্তে আস্তে কাছে গেলেই আহ্লাদে আটখানা হবে। আবার আগের মতো সবকিছু হয়ে যাবে। কিন্তু হাড় বদমাশটার হাড়ে হাড়ে যে শয়তানি আর কুচুটেপনা–তা তখনও বুঝিনি। নেমকহারামির জন্যে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, বিটলে বাচ্চার রক্তে ক্ষমাঘেন্না জিনিসটা যে একেবারেই নেই, সে শিক্ষা হল বড় কষ্টের মধ্যে দিয়ে।

মাথা খাটিয়ে অনেক ফিকির, অনেক কায়দা আবিষ্কার করেছিলাম বেল্লিকটাকে বশ করতে। সব আর বলব না। কিন্তু হার মেনেছি প্রতিবারেই। নরকের পোকা কোথাকার! এখনও ভাবলে লজ্জায় মাথা হেট হয়, গাল লাল হয়! শেষকালে খোশায়োদ ছেড়ে

মারধর করেছিলাম। প্রবালের ডেলা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতাম দূর থেকে। কোঁত কোঁত করে গিলে ফেলত। খোলা ছুরি টিপ করে ছুঁড়ে ছিলাম। বড় ছুরি বলে গিলতে পারেনি–কিন্তু ছুরি ফিরিয়ে আনতে কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। না খাইয়ে মারবার মতলব এঁটেছিলাম। মাছ ধরাই ছেড়ে দিলাম, হারামজাদা অল্প জলে নেমে পোকা খুঁটে খুঁটে খেতে আরম্ভ করল। অর্ধেক সময় গলা-জলে ডুবে বসে থাকতাম, বাকি অর্ধেক তাল গাছের ডগায়। একটা গাছ ছিল পেল্লায় উঁচু। শয়তানের বাচ্চা একদিন সেখানেও নাগাল ধরে ফেলল। ঠোক্কর মেরে আমার পায়ের ডিম থেকে এক চাকলা মাংস খুবলে নিয়ে গেল। সে কী অসহ্য যন্ত্রণা! ওই অবস্থায় তাল গাছে ঘুমানো যায়? আপনি পারবেন? সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি, চমকে চমকে উঠেছি।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমারই দ্বীপে রাজার মতো হেলেদুলে টহল দিচ্ছে লোপ পেয়ে যাওয়া একটা জানোয়ার, পায়ের চেটো ছোঁয়াতে দিচ্ছে না মাটিতে। লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, শেষকালে কান্নাকাটিও করেছি ক্লান্তিতে। আশা মিটিয়ে গালাগালও দিয়েছি। এ কী নষ্টামি? আমারই দ্বীপে আমাকে তাড়িয়ে গাছের ডগায় তুলে দেওয়া! জাহান্নমে যেতে বলেছি যতবার, ততবারই তেড়ে এসে এমন ঠোক্কর মেরেছে যে, পালাবার পথ পাইনি। ভয়ে কাঁটা হয়ে থেকেছি খোদ শয়তান–পাখি না কচু! দেখতে যেমন জঘন্য, স্বভাব চরিত্রও তা-ই? ছি! ছি!

এই অবস্থা বেশি দিন চলতে পারে না। বেদম হয়ে পড়েছিলাম। শেষে মাথায় খুন চাপল। দক্ষিণ আমেরিকায় দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে যেভাবে জানোয়ার ধরে, সেইভাবে হারামজাদাকে কুপোকাত করব ঠিক করলাম। মাছ ধরার দড়ি যা কিছু ছিল, সব একটার পর একটা বাঁধলাম। লম্বায় হল প্রায় বারো গজ। একদিনে হয়নি। ল্যাগুন

থেকে লম্বা লম্বা ঘাস আর আঁশ তুলে কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি জলে, কখনও গাছের ডগায়। তারপর দুটো বড়সড়ো প্রবালের টুকরো বাঁধলাম দড়ির ডগায়। গলা-জলে ডুবে বসে থেকে মাথার ওপর বনবন করে ঘুরিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম শয়তানের বাচ্চার দিকে। জড়িয়ে গেল দুপায়ে। যত লাফায়, তত বেশি জড়ায়। শেষকালে উলটে পড়তেই উঠে এলাম জল ছেড়ে। ছুরি দিয়ে কাটলাম গলা...

ভাবলেও মনটা খারাপ হয়ে যায় আজও। মানুষ খুন করছি যেন মনে হয়েছিল। কিন্তু রাগে তখন মাথায় আগুন জ্বলছে। বালির ওপর রক্তের পুকুরে সুন্দর পা আর বাহারি গলা মুচড়ে যন্ত্রণায় ছটফটানির দৃশ্য আজও ভাসছে চোখের সামনে।

সেই থেকে নিঃসঙ্গতা অসহ্য হয়ে উঠল। ডিম থেকে বার করে যাকে বড় করেছিলাম, দিনের পর দিন কত মজার খেলা খেলে আমার নিঃসঙ্গতাকে যে ভরিয়ে রেখেছিল–সে না থাকায় খাঁ খাঁ করতে লাগল চারদিক। অসহ্য! অসহ্য! একেবারে মেরে ফেলাটা ঠিক হয়নি, জখম করলেই পারতাম। তারপর না হয় সেবাশুশ্রূষা করে আবার চাঙ্গা করে তোলা যেত। প্রবাল পাহাড় খোঁড়বার সরঞ্জাম ছিল না সঙ্গে। থাকলে, পাথর খুঁড়ে মানুষের মতোই তাকে কবর দিতাম। হতে পারে বেইমান জানোয়ার, আমি কিন্তু তাকে মানুষের মতোই দেখেছিলাম। ভালোবেসেছিলাম। মানুষের মাংস কি মানুষ খেতে পারে? আমিও পারিনি। জলে ফেলে দিয়েছিলাম। মাংস খেয়ে শুধু হাড়গুলো ফেলে গিয়েছিল মাছেরা। পালক পর্যন্ত রাখেনি। তারপর একদিন একটা পালতোলা জাহাজ হঠাৎ এসে গেল অ্যাটলে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে উইন্সলো নামে একজন দোকানদারকে বেচে দিয়েছিলাম হাড়গুলো। সে বেচেছিল হ্যাঁভার্সকে। হ্যাঁভার্স লোকটা একটা আস্ত পাঁঠা, অত বড় হাড় দেখেও জিনিসটার কদর করতে পারেনি। তার মৃত্যুর পর হইচই আরম্ভ হল ইপাইওরনিসকে নিয়ে। নামটা দেওয়া হয়েছিল তখনই, তা-ই না? পুরো নামটা জানেন?

ইপাইওরনিস ভ্যাসটাস, বলেছিলাম আমি। গজখানেক লম্বা একখানা উরুর হাড় পাওয়া গিয়েছিল সবার আগে। এর চাইতে বড় হাড় আর নাকি হয় না। নাম দেওয়া হল ইপাইওরনিস ম্যাক্সিমাম। তারপর পাওয়া গেল সাড়ে চার ফুট লম্বা আর-একখানা উরুর হাড়। নাম দেওয়া হল ইপাইওনিস টাইটান। হ্যাঁভার্সের মৃত্যুর পরে পাওয়া গেল আপনার ভ্যাসটাস। তারপরেও পাওয়া গিয়েছিল ভ্যাসটিসিমাস।

মুখের কাটা দাগটায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বুচার বললে, এখন বলুন তো মশায়, আমার সঙ্গে অমন জঘন্য ব্যবহারটা করা কি উচিত হয়েছে ইপাইওনিস ভ্যাসটাসের?